হুমায়ূনের সাথে দেখা

অভীক দত্ত

হুমায়ূনের সাথে দেখা

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছি। ওখান থেকে যাব সিকিম। ট্রেনের সব টিকিট কনফার্ম হয়নি। মন মেজাজ খারাপ। সাথে আমার এক বছরের ছেলে। চারজন যাব তার মধ্যে দুটো টিকিট কনফার্ম। বউএর সাথে ঝগড়া হব হব করছে। অনেকবার বলেছিল স্লিপার ক্লাসে যেতে আমি পাকামো মেরে এসিতে কাটতে গিয়ে এই কেস করেছি। প্ল্যাটফর্মেই স্টেশন বন্ধু একজন ঠিক করেছি ট্রেনে তুলে দেবে। একই দাপটে বাবা মা-ও বকে যাচ্ছে। ঠিক করেছি একটা বার্থে আমি আর বউ শেয়ার করব, আরেকটায় বাবা মা। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই হুড় মুড়িয়ে উঠে পড়লাম। বিরাট ভিড় স্টেশানে। কোন মতে উঠেই আমরা ভিখারির মত এদিক ওদিক দেখছি। সব ভারী ভারী লটবহর নিয়ে ঢুকছে। এসি টু টিয়ার। ছেলে কোলে নিয়ে বসতেই সামনে যিনি বসেছেন তাকে দেখে একটা ধাক্কা মত খেলাম। এও কি সম্ভব? বইমেলার সময় বাংলাদেশের স্টলে লম্বা লাইন দিয়ে প্রতি বছর এনার বই কিনি। ইন্টারনেটে যেখানে ফ্রি তে ইবুক পাওয়া যায় সেখান থেকে ডাউনলোড করি পাগলের মত। হুমায়ূন আহমেদ।

এ অসম্ভব! আমি ট্রেনের ওই টেনশানের মধ্যেই

ছেলে কোলে নিয়ে হা করে দেখছি ভদ্রলোককে। উনি তো মারা গেছেন দেখলাম দু মাস আগে। তবে ইনি কি ওনারই মত দেখতে? বাবা মা পেছনের দিকের সিটে বসেছেন। আমার বউ ওইখানেও গজগজানি শুরু করেছে, কতবার বললাম স্লিপারে কাটো স্লিপারে

কাটো এবার বোঝ ঠেলা। আমার বউয়ের কথা শুনেই হয়ত সামনের হুমায়ূন আহমেদ বলেউঠলেন,
"আপনারা কজন? আমার সাথে দু জন আসেননি, অসুবিধে হবে না।"

শুনে যেন হাতে চাঁদ পেলাম । এক লাফ দিয়ে বাবা মাকে নিয়ে চলে এলাম। টিটি ঝামেলা সব কাটিয়ে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে দেখি হুমায়ূন আহমেদ নেই! বাথরুমে যেতে গিয়ে দেখি ট্রেনের একদিকের একটা দরজা খোলা। আর ভদ্রলোক সিগারেটে টান দিয়ে চলেছেন। বয়স আনুমানিক ৬৫-৬৬ হবে। চুল মেহেন্দি করার মত লাল কালোর শেড। একেবারে হুমায়ূন আহমেদ। আমি বললাম, "আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব!"

সিগারেট খেতে খেতেই ভদ্রলোক মেজাজে হাত নাড়লেন। "নানা, ধন্যবাদের কি আছে, এতো না করার কিছুই নেই!" আমি আর সামলাতে পারলাম না শেষমেশ বলেই ফেললাম, " কিছু মনে করবেন না, আপনাকে না একদম হুমায়ূন আহমেদের মত দেখতে"।

ভদ্রলোক সিগারেট টান মারতে মারতেই বললেন "দেখতে কি বলছেন আমি তো হুমায়ূন আহমেদই"।

আমি ভিরমি খেলাম। বললাম," সেকি, হুমায়ূন আহমেদ তো দুদিন আগে মারা গেছেন",

ভদ্রলোক বললেন, “দূর দূর, মৃত জীবিত তুমি কি বুঝবে হে ছোকরা?দুদিনের ছেলে, তুমি কি করে জানবে।“

কথা বলতে বলতে বৃষ্টি চলে এল। তুমুল বৃষ্টি। জলের ঝাপটা লাগতে লাগল। আমি দরজা বন্ধ করতে গেলাম। হুমায়ূন স্যার বাঁধা দিলেন, “তোমার বৃষ্টিতে সমস্যা হলে ভিতরে যাও। আমি ভিজব”। আমি অপ্রস্তুত হলাম। তারপরই উৎসাহের সাথে বললাম, “ও আপনার তো বৃষ্টি দারুণ প্রিয়। শুনেছি আপনার নুহাশ পল্লীতে আপনি একটা ঘর বানিয়েছিলেন বৃষ্টি বিলাস বলে!”

শুনে ভিজতে ভিজতে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন “দূরসেতো অনেক পরে। ছোটবেলায় কাদামাঠে ফুটবল খেলে কতবার যে বাড়িতে মার খেয়েছি! বাবার চাকরি সূত্রে যেখানেই গিয়েছি সেখানেই বৃষ্টিতে ভিজেছি। আমার বাবাও আমার মত বৃষ্টি পাগল ছিলেন”।

আমি বললাম “আপনি তো জ্যোৎস্নারও তো খুব ভক্ত। চান্নি পসর রাইত শুনেছি জেগেই কাটিয়ে দেন!”

অবহেলার সাথে হাসলেন। আমার বুকটা দুরুদুরু করলেও জীবিত কিংবা মৃত হুমায়ূন আহমেদকে দেখার আনন্দে লাফাচ্ছিল। আমরা কলকাতায় থাকি। কত ভুলভাল খবর

আসে। এরকমও তো হতে পারে হয়ত হুমায়ূন আহমেদের জায়গায় অন্য কোন হুমায়ূন মারা গিয়েছেন। জানিই না সেটা। এখন মনে হচ্ছে ওই খবরটা ঠিক না।

আমার বউ আমার দেরী দেখে একবার দেখে গেল। মুখ খুশি খুশি ভাব। ওকে আর বললাম না বিয়ের পর পর তুমি যে জন্যে আমার উপর রাগ করেছিলে সেই কারণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। মানে কিছুই হয় নি। আমার খেতে খেতে বই পড়ার অভ্যাস আছে। পড়ছিলাম হিমু ও পাঁচটি নীলপদ্ম। হিমু আর মরিয়মের গল্পে যখন আমি বুঁদ আমার বউ জিজ্ঞেস করেছিল মাংস কেমন হয়েছে। আমি শুনিনি। সে নিয়ে দু দিন কথা বলেনি।

হুমায়ূন সাহেব বউ চলে যাবার পর আমায় দেখে চোখ নাচালেন, "বউ"? আমি বললাম "হ্যাঁ"। তারপর একটু খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না, "আপনার তো শুনেছি দুই খানা"। রাগলেন না। আমায় তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে বললেন, "তোমাদের শীর্ষেন্দু কি লিখেছে হে কাগজের বউ এ? কোন জিনিয়াস এক মেয়েতে সন্তুষ্ট হয় না। আমি কে জান? আমি পলিমার সায়েন্সের ডক্টরেট। দিস্তে দিস্তে লিখিইনি খালি। প্রথম যখন সিরিয়াল করা শুরু করি দেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলাম। আমার এক একটা বইয়ের কত কাটতি জান? তোমাদের দেশে তো আনন্দবাজার, দেশ বললে তোমরা হাগ মোত। আমাদের দেশে আমিই দেশ"। আমি বাঁধা দিলাম,"তা বলে মেয়ের বান্ধবী?"

আবার রাগলেন “যেটা বুঝ না, সেটা নিয়ে তর্ক কোর না। পৃথিবীর কোন পুরুষ নিজের বিয়ের পর সেই বউ নিয়ে সারাজীবন ঘর করতে চায়?ভালবাসা বয়স দেখে হয় না। মন দেখে হয়। পুরুষ নারীর মধ্যে কি দেখে? নারীর চোখে নিজের মুগ্ধতা দেখতে চায়। আমার মনে হয়েছিল আমি করেছি। বেশ করেছি। তোমাদের কি হে বাপু? আমার ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তিগতই থাক না!”

আমি মজা পেলাম। হুমায়ূন স্যারের মত লোক এত সোজা সরল জানা ছিল না।এ দেখি মুখের কোন আগল নেই। আমি আরও খোঁচানর চেষ্টা করলাম, “আচ্ছা আপনি কোনটা? হিমু? মিসির আলী? না সেই লেখক ভদ্রলোক যিনি ডিভোর্সের পর শালীর চোখে নিজের মুগ্ধতা দেখার জন্য আজিব কাজ করতেন?”

স্যার সিগারেটে আরেকটা লম্বা টান দিলেন। বুঝলাম অনেক কিছু বলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু আমাকে হতাশ করে বললেন, “আমি? আই অ্যাম নো বডি”। আমি এবার বেপরোয়া, বললাম “আপনি যাই বলেন, আমার কিন্তু কল্পবিজ্ঞানের গল্পের ক্ষেত্রে আপনার থেকে আপনার ভাই জাফর ইকবালের লেখা বেশি ভাল লাগে”। হুমায়ূন আহমেদ হাসলেন, “তুমি কি এটা আমাকে রাগাবার জন্যে বললে? বলে লাভ নেই, আমার ভাই আমার থেকে ভাল লিখলে তোমাদের থেকে অনেক বেশি খুশি হই আমি”। আমি বললাম, “কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ের পর আপনাকে তো প্রায় এক ঘরে করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে তো ইকবাল সাহেবও ছিলেন”।

হুমায়ূন সাহেবের চোখটা একটু জ্বলে উঠল যেন, বললেন "তোমাকে আমি আগেও বলেছি ডোন্ট ইন্টারফেয়ার ইনটু মাই পার্সোনাল অ্যাফেয়ার"।

আমি চাপ খেয়ে গেলাম। ক্ষমা চেয়ে নিলাম। বৃষ্টিটা ততক্ষণে ধরেছে, আর কি আশ্চর্য আজ পূর্ণিমা নাকি জানতাম না তো! আকাশজোড়া চাঁদের আলো। হুমায়ূন আহমেদ মুগ্ধ হয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন। এরমাঝে বর্ধমানে ট্রেন ঢুকল। দু একজন রাতের ট্রেনে তাড়াহুড়ো করে উঠল। টিটি এলেন। দরজা বন্ধ করতে বললেন। হুমায়ূন স্যার বারণ করলেন। টিকেট চেকার ভদ্রলোকটিও কেন জানিনা কাঁধ ঝাকিয়ে চলে গেলেন।

আমি নীরবতা ভঙ্গ করলাম। "কিছু মনে করবেন না, পরের দিকে আপনার হিমু পড়ে বিরক্তি লাগত। ওই একই লেখা। একই অলৌকিক কিছু করার চেষ্টা। সেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিগ ব্যাং থিয়োরি আনার চেষ্টা!"

হুমায়ূন স্যার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, নরম গলায় বললেন, "একটা কুমারী মেয়েকে যখন বিয়ে করো তখন প্রথম কিছুদিন ভাল লাগে। তারপরে মনে হয় না ওহ সেই একই চিবুক, ওই একই চোখ, একই রকম হাসি? ভ্যারাইটি পাও? কয়টা লেখক আছে প্রথম প্রেমের মত লিখে যেতে পারে দীর্ঘকাল? নীললোহিত তো আমিও পড়ি। এখনের লেখা আর আগের লেখা এক লাগে? সেই তো দিকশুন্যপুর, বন্দনাদি আর সংসার পালানো মনোভাব। আমাদের হিমুর পশ্চিমবঙ্গীয় ভারসান যেন। আর শীর্ষেন্দু সমরেশও এখন পাতে দেবার মত নয়। নামে চলে"।

আমি হাসলাম। খুব একটা ভুল কথা নয়। বললাম "তবে আপনি কিন্তু কবিতায় ফ্লপ যাই বলেন"।

হুমায়ূন স্যার বললেন, "তা যদি তুমি বই বিক্রির হিসেবে বল তাহলে সুপার হিট। আর যদি হুমায়ূন আহমেদের অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞেস কর তাহলে হ্যাঁ। আমি মেনে নিই যে আমি ফ্লপ"।

আমি আবার ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারলাম না, "আচ্ছা দ্বিতীয় বিয়ের পর আপনার ছেলেমেয়ের জন্যে মন খারাপ লাগত না?আপনার তো এরকম একটা উপন্যাসও আছে যেখানে বাবা দ্বিতীয় বিয়ের পর লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলে মেয়েদের দেখতে আসত। একই ঘটনা কি আপনার ক্ষেত্রে ঘটেনি?"

এই সময় আর ফুসে উঠলেন না সাহিত্য সম্রাট। বললেন "তা কি আর হয় না। কিন্তু একটা নতুন দরজায় ঢুকলাম যখন পুরনো কিছু দরজা তো বন্ধ করতেই হল। আমার ছেলে নুহাশ চিংড়ি বড় ভালবাসে। ওর সাথে একবার দেখা করতে যাই বড় বড় চিংড়ি নিয়ে। ওকে দিয়ে আসি। তারপর কদিন মন খুব খারাপ ছিল। লিখতে যেতাম, লিখতে পারতাম না, রাইটার্স ব্লক মত হয়ে গিয়েছিল। সে সময়টা শাওন খুব সাহায্য করেছিল। কিন্তু শাওনকেও সব কথা বলতে পারিনি। কিছু কিছু কথা বলা যায় না"।

আমি বুঝতে পারলাম স্যারের মুড অফ হচ্ছে, কথা ঘোরালাম, “আচ্ছা আপনার বেশিরভাগ লেখাতেই কোরানের খুব উদ্ধৃতি থাকে। তবে সেই লেখাগুলি বেশিরভাগই সাম্প্রতিক কালের।আপনার লেখা থেকেই আমরা হিন্দু পাঠকরাও মাগরেবের নামাজ, ফজরের আজান, ইয়া মুকাদ্দেমু ইত্যাদির সাথে মিশে গিয়েছি যেন। আমিও আজকাল বেশি বিপদে পড়লে ইয়া মুকাদ্দেমু বলে ফেলি। আপনিও কি বেশিরভাগ বাঙালীর মত বুড়ো বয়সে ধর্মে মন দিলেন? আর আপনার বেশিরভাগ উপন্যাসের নাম রবীন্দ্রনাথের গান থেকে “তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে” এই টাইপের অথবা কখনও কখনও অতি নাটকীয় “আকাশজোড়া মেঘ”, “চলে যায় বসন্তের দিন”, “আজ আমি কোথাও যাব না”, “পেন্সিলে আঁকা পরী”, “আমার আছে জল”, “বাসর” বলে শেষ করা যাবে না। এই রকম কেন?”

হুমায়ূন আহমেদ করুণ হাসলেন। বললেন “তোমার বয়সী ছেলেরা একটু নাস্তিক হয়, একটু রবীন্দ্রবিদ্বেষীও হয়। আমিও ছিলাম। তারপর বয়স যত বাড়তে থাকল অবধারিত ভাবে ধর্ম নিয়ে লেখা পড়া শুরু করলাম। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ছোট থেকেই আমার পাশে পাশে চলছেন। তারপর সবকিছু যেন একটা জায়গায়, একটা বিন্দুতে এসে মিলে গেল”।

রাতের ট্রেন ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে স্টেশনগুলি আলোর বেগে হু হু করে বেড়িয়ে যাচ্ছে, আমার বউ, বাবা, মা সবাই এক বার করে ডেকে ডেকে গেছে। কাটিয়ে দিয়েছি। এরকম সুযোগ আর কতজন পায়?

আমার মনে পড়ে আমার পড়া প্রথম হুমায়ূন আহমেদ বেশি দিন আগে না। বছর ছয়েক আগে হবে। পড়া পড়ি নিয়ে আমি বেশ উন্নাসিকও ছিলাম। হঠাৎ পূজাবার্ষিকী দেশে হুমায়ূন আহমেদের "নীল মানুষ" উপন্যাসটি পড়ি। পাগল হয়ে গিয়েছিলাম লেখাটি পড়ে। তারপর পাগলের মত যেখানে হুমায়ূন আহমেদ পেতাম সেখানে পড়তাম। একটা সময় ছিল যখন সারারাত ধরে হিমু,মিসির আলী, শুভ্র গোগ্রাসে গিলতাম।চোখের সামনে ঢাকা শহর দেখতে পেতাম যে রাস্তা দিয়ে হিমু হেঁটে যেত। কলাবাগান, গুলশন কোনদিন বাংলাদেশ না গিয়েও সড়গড় হয়ে গেছে যেন। কতবার তার অসমাপ্ত উপন্যাস পড়ে মনে মনে গালাগাল দিয়েছি। এখন আমার রক্তের সাথে মিশে গিয়েছে যেন হুমায়ূন আহমেদ। আজ সেই মানুষটাকে সামনে পেলে একরাত ট্রেনে না ঘুমালে হবে না?

কৌতূহলী প্রশ্নটা অনেকক্ষণ মনের মধ্যে ছিল। শেষে করেই ফেললাম, "আচ্ছা আপনি দার্জিলিং মেইলে কোথায় যাচ্ছেন?"

হুমায়ূন আহমেদ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। আমার দিকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকালেন, "বলত আমার ওই উপন্যাসটার নাম কি যেখানে প্রেমিকা বা প্রেমিক মারা যাবার পর বার বার চেষ্টা করা হয় তাকে বাঁচিয়ে আনার? আমার নামটা মনে পড়ছে না। "নি" কি?"

আমারও মনে পড়ছিল না। মাথা নাড়লাম। তিনি বললেন “ধরে নাও আমি কোথাও যাচ্ছি না, কোথাও যেতাম না, ধরে নাও আমি মেঘের ওপর বাড়ির সেই আত্মা যে মৃত্যুর পর মাঝে মাঝে সব কিছু দেখতে পেত,শুনতে পেত”।

আমার শিউরে ওঠা উচিত ছিল, কারণ আমার স্পষ্ট মনে পড়ে গেছে হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর কী একটা যেন খুব বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, তার মৃতদেহ নিয়ে টানা হেচড়া হয়েছিল। কিন্তু আমার কেন জানিনা ভয় পাচ্ছিলাম না। বললাম, “আপনি কি তবে চলে যাবেন?”

আমার সামনের হুমায়ূন আহমেদ ধীরে ধীরে, অতি নাটকীয়তা ছাড়াই আবছা হওয়া শুরু করল, আমি অস্থির হয়ে উঠলাম, “যাবার আগে বলে যান, আর দুটো সিট যারা আসেননি সেটা কাদের টিকিট ছিল?”

উনি বলতে চেষ্টা করলেন, কিছুই শুনতে পেলাম না। ট্রেনের দমকা বাতাস এসে লাগছিল আমার নাকে মুখে। কিছুই দেখা গেল না আর। বাইরে হুমায়ূন আহমেদের প্রিয় জ্যোৎস্না। আকাশ বাতাস গাছ পালা সব জ্যোৎস্নালোকে ভেসে যাচ্ছিল। একেই বোধহয় উনি “চান্নি পসর রাইত” বলে উল্লেখ করেছিলেন।